গ্রামীণ ভারত

January, 2012 edtion মাঘ, ১৪১৮ সংকলন

সম্পাদকীয়ঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত গ্রামীণ ভারত নব কলেবরে প্রকাশিত হল। বর্তমান সময়ের কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়কে অবলম্বন করে এই সংকলন প্রকাশ করা হল। এই সংকলনের সকল লেখক/ লেখিকাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই তাদের মূল্যবান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সহজবোধ্য ভাবে তুলে ধরার জন্য। পত্রিকার সকল প্রবন্ধ - তার শব্দের মিতব্যয়ে ও ভাষার সারল্যে যে কোন পাঠকের কাছেই সহজবোধ্য হবে ও পাঠকের আগ্রহ আদায় করে নিতে সক্ষম হয়ে উঠবে। আলোচিত প্রকল্পগুলির বিস্তারিত আলোচনা সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা ও তার থেকে উদ্ভব হওয়া দ্বিধা দূর করতে সাহায্য করবে। সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি এই পত্রিকা মারফৎ আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সমৃদ্ধ হতে পারবে ও পরিষেবা প্রদানে আরও আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারবে। তাতেই সংকলনটি সাফল্য লাভ করবে।

বিশেষ আবেদন ঃ সকল স্তরের পদাধিকারী, আধিকারিক, কর্মচারি, সুহৃদ পাঠক/ পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে আবেদন রাখি - আপনারা আপনাদের এলাকার দৃষ্টান্তমূলক কাজ, সাফল্যের কাহিনী, ভালো প্রয়োগ, দু চার কথা সহ প্রবন্ধ আকারে (ছবি সহ) আমাদের কাছে পাঠালে, আমরা বিবেচনা পূর্বক তা আপনার নাম দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। এই ভাবে আপনার এলাকার ভালো কাজ অন্য জায়গায় বিস্তারিত হতে পারবে ও পারস্পরিক সংযোগ কায়েম হবে। এ ছাড়াও আপনার কাহিনী, কবিতা, ছবি পাঠাতে পারেন যা পরবর্তি গ্রামীণ ভারত সংকলনে স্থান পেতে পারে।

সম্পাদক ও অধিকর্তা
রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী

সম্পাদক মন্ডলীঃ

যুগ্ম সম্পাদক ঃ শ্রী দেবাশিস্ নন্দী, যুগ্ম অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী।

সহ-সম্পাদক ঃ শ্রী সঞ্জীব সেন, অনুষদ সদস্য, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী ও শ্রী দীপক কুমার শীল, গ্রন্থাগারিক, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী

যোগাযোগ ঃ দূরভাষ ০৩৩২৫৮২-৮১৬১/৫৯৭৫;
ফ্যাক্স ঃ ০৩৩২৫৮২৮২৫৭

SIPRD E-mail ID Address :
wbsiprd@vsnl.net / nregacellsiprd@gmail.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃপঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

প্রবন্ধ সূচী

১. আয়লা কবলিত এলাকায় আয়লা পরবর্তী (সু-স্থায়ী কৃষি) পদক্ষেপ পৃঃ ২-৬

২. জৈব কৃষি এবং বায়ো ও বোটানিক্যাল পেষ্টিসাইড। পৃঃ ৬-৭

৩. প্রধান ও উপ-প্রধানের অপসারণ। পৃঃ ৮-৯

৪. মেয়েদের পাতা - সামাজিক লিঙ্গবৈষম্য ও মানবী বিদ্যা বিভাগ, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা পশ্চিমবাংলা। পৃঃ ৯-১২
- রাজ্যের প্রথম মহিলা সংসদ।
- পঞ্চায়েতের তিন কন্যার কাহিনী।

৫. একনজরে ২০১১এর জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গের কিছু পরিসংখ্যান পৃঃ ১২

৬. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ -পুনর্গঠিত ব্যবস্থা। পৃঃ ১৩-১৫

৭. রাজ্যস্তরে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযানের কর্মশালা। পৃঃ ১৫

৮. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প অভিযোগ প্রতিবিধান নিয়মাবলী, ২০০৯ - গল্প হলেও সত্যি। পৃঃ ১৬

সংস্থা সংবাদঃ ● গত ২০-২১ সেপ্টেম্বর, ২০১১ রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থায় সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর উপর জাতীয় স্তরের কর্মশালা আয়োজিত হয়ে গেল। ● রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থায় গত ৩০/০১/২০১২ আয়োজিত হয়ে গেল "পশ্চাৎপদ এলাকা চিহ্নিতকরণের সূচক ও মাপকাঠি" এর উপর রাজ্য স্তরীয় কর্মশালা।

আয়লা কবলিত এলাকায় আয়লা পরবর্তী (সু-স্থায়ী কৃষি) পদক্ষেপ

শ্রীমতী সুস্মিতা চৌধুরী, বরিষ্ঠ অনুষদ সদস্যা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী।

২০০৯ সালের মে মাসে বিধ্বংসী ঝড়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার একটি বিরাট অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এলাকায় চাষবাস, পশুপ্রাণী সম্পদের বিরাট ক্ষতি হয়। বিস্তীর্ণ এলাকায় নোনাজল ঢুকে পড়ায় চাষবাসের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তা অকল্পনীয়। সরকারী সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিকল্প চাষপদ্ধতি ও উপকরণ নিয়ে চাষীদের পাশে এসে দাঁড়ান। 'স্বনির্ভর'- এমনই একটি সংগঠন এঁরা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার কয়েকটি এলাকায় চাষীদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে কাজ শুরু করেন। তাদের প্রয়াস ও প্রয়োগের কথা নীচে বর্ণনা করা হলো ঃ—

১) নোনা সহ্যকারী ধান চাষ ঃ

আয়লার পর এলাকার মাটি লবণাক্ত হওয়ার ফলে এলাকার কয়েক বছর ধরে যে সব (High yielding) ধানের চাষ হত সেগুলি থেকে ভালো চারা বা পরবর্তীকালে তা থেকে ভালো উৎপাদন পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। ফলে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। সেই সময় কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে নোনা সহ্যকারী কয়েকটি ধান বীজ (তালমুগুর, সোলের পোনা, দাঁতশাল, কামিনীভোগ, গেউস, ঘুনসী, কুমড়োগোড় ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। বর্তমানে লবণ সহ্যকারী এই সব ধানের চাষ এলাকাতে যথেষ্ট বেড়েছে।

২) নোনা সহ্যকারী সবজির চাষঃ

বাড়ীর আশেপাশের যে সমস্ত জায়গা পড়ে থাকে, যেমন বাড়ীর আশেপাশের রৌদ্র ও ছায়ার জায়গা, ঘরের চাল, পুকুর ও কলের পাড় বড় গাছ ইত্যাদি জায়গায় সারা বছর জৈব পদ্ধতিতে পরিকল্পনা মাফিক সুষ্ঠ ব্যবহারের দ্বারা ভালোভাবে সবজি চাষ সবজি চাষ করা যায়।

আয়লার পর এলাকার মাটি লবণাক্ত হওয়ার ফলে অনেক সবজি চাষ করা সম্ভব হয়নি তখন কিছু সবজি নির্বাচিত করা হল যারা নোনাতেও ভাল হবে। যেমন — পালং শাক, পুঁইশাক, বীট, ওলকপি, কাটোয়া ডাটা, দেশি ওল ইত্যাদি।

১. টাটকা ও বিষ মুক্ত সবজি পাওয়া গেছে।

২. বারো মাস নানা রকম সবজি পাওয়া গেছে।

৩. বাজারের উপর নির্ভরতা কমেছে (গড়ে সপ্তাহে ৩-৪ দিন পরিবারের সবজির যোগান সবজি বাগান থেকে আসে।

৪. বাড়ীর পড়ে থাকা জায়গায় সুষ্ঠ ব্যবহার করে কিছু সবজি উৎপাদন করা গেছে। এতে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত সবজি বিক্রি করে অনেকেই পয়সা উপার্জন করছেন।

৫. পরিবারের পুষ্টির যোগান দিচ্ছে।

৬. বাড়ীর চারধারের পরিবেশ পবিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকছে।

৩) ল্যান্ডশেপিং (Landshaping) ঃ

অনাবাদি বা এক ফসলী জমিকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সুস্থায়ী চাষের মাধ্যমে সারা বছর বহুমুখী উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত করাকে ল্যান্ডশেপিং বলে। এতে

১) পর্যাপ্ত পরিমান বৃষ্টির জল ধরে রেখে সারা বছর কৃষি ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যায়।

২) অনাবাদী বা এক ফসলী জমিকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সুস্থায়ী চাষের মাধ্যমে বহুমুখী উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিনত করা যায়।

৩) এক ফসলী এলাকার মানুষ কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যায়, সেই সকল চাষীর কমপক্ষে ১.৫ থেকে ২ বিঘা জমির অবস্থার পরিবর্তন করে চাষ করে কর্ম দিবস সৃষ্টি হয় ফলে শ্রমজীবী ক্ষেতমজুর হয়ে বাইরে কাজের জন্য যেতে হবে না। এই কাজটি করার জন্য পঞ্চায়েতের MGNREGS প্রকল্প, SDP (Sundarban Development Programme) ও কলকাতার ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন এন্ড সার্ভিসেস সেন্টার (DRCSC) এর সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

ল্যান্ডশেডিং এর ফলাফলঃ

১) অল্প জমিকে বেশি জমিতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে।

২) উৎপাদন অনেক গুণ বেড়েছে ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা তৈরী হয়েছে।

৩) জল সংরক্ষণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

৪) বর্তমানে আগ্রহী চাষীর সংখ্যা বেড়েছে এবং স্বনির্ভরের শাখা সংগঠনের সাথে চাষীরা যোগাযোগ রেখে আরো চাষী ল্যান্ডশেপিং এর কাজে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

গরীব পরিবারগুলির মধ্যে বাছাই করা কিছু পরিবারকে নিয়ে দল তৈরী করে তাদের মাধ্যমে ল্যান্ডশেপিং করে চাষ করানো হয়েছে। আয়লার পর স্বনির্ভরের চাষীরা মোট ১৭ জনকে ল্যান্ডশেপিং করার জন্য সাহায্য করেছেন এবং দেখাদেখি আরো ৩০ জন চাষী তাদের জমিকে সঠিকভাবে গঠন দিতে পেরেছেন।

৪) পয়রা চাষের (Relay Croping) পরীক্ষা নিরীক্ষাঃ

পয়রা বা মাটির রসকে কাজে লাগিয়ে একটি বাড়তি ফসল ফলানোর পদ্ধতি আগে ছিল এবং বর্তমানেও পয়রা চাষ হচ্ছে। বিগত দিনের আমন ধান কাটার পর জমিতে কেবলমাত্র খেসারি পয়রা হিসাব চাষ করতেন, আসলে এটি না চষে চাষ। যেখানে আমন ধান কাটার ৭-১৫ দিন আগে ডাল, মশলা, তৈলবীজ জাতীয় ফসলের বীজ ছড়িয়ে একটি বাড়তি ফসল ফলানো হয়। শুধু মাত্র খেসারী নয় এখানে তিসি, মুসুর, ধনে, সরিষা, মটর, গম ইত্যাদি ফসল পয়রা পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে। বর্তমানে একক ফসলের পয়রার পরিবর্তে একাধিক ফসলের (মুসুর ও সরিষা, খেসারী ও সরিষা, গম ও সরিষা ইত্যাদি) মিশ্রণে পয়রা চাষের প্রসার ঘটেছে। "স্বনির্ভর" নোনা কবলিত হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে পয়রার উপর পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজটি করা হয়। বর্তমানে "স্বনির্ভর" মিশ্র পয়রা চাষের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

পয়রা করার প্রভাব/সুবিধাঃ

১) আমন ধান কাটার পর পড়ে থাকা ১/২ ফসলী জমিতে ২/৩ ফসলী করা সম্ভব হয়েছে।

২) কোনো রকম চাষ দরকার হয় না। ১ টি সেচে ফসল করে তোলা যায়।

৩) সঠিক সময়ে চাষ সম্ভব হয়েছে।

৪) পয়রা চাষের মাধ্যমে বিঘা প্রতি ১২০০ টাকা চাষ খরচ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে অথচ চাষ পদ্ধতি ও পয়রা পদ্ধতির চাষের উৎপাদনের কোনো পার্থক্য নেই।

৫) অন্য এলাকার চাষীরা বা দূরের আত্মীয় স্বজনেরা এই পদ্ধতির চাষ দেখে নিজেরা চাষ শুরু করেছেন। বর্তমানে ৫টি ব্লকের আশেপাশের অনেক ব্লকে পয়রা চাষ ছড়িয়ে পড়েছে।

৫) বীজ ভান্ডার (বীজ বিনিময় ও বিতরণ কেন্দ্র)ঃ

এতে কী সুবিধা হয়েছে - ১) উন্নতমানের দেশী বীজ চাষীরা সহজে বীজ ভান্ডার থেকে সংগ্রহ করছেন। ২) সময় মতো বীজ পাচ্ছেন। ৩) দেশী বীজের উৎপাদন দীর্ঘ বছর ধরে বজায় থাকে। সার কম লাগছে। রোগ বিশেষ লাগে না। ৪) চাষীরা নিজেরা বীজ উৎপাদন করে সংরক্ষণ করছেন ফলে বাজারের হাইব্রিড বীজের উপর নির্ভরতা কমেছে।

আগে পুরোপুরি দেশী প্রজাতির ধান ও সবজি চাষ হত। ২০০৯ সালে আয়লা হওয়ার পর থেকে হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের আয়লা কবলিত এলাকাতে হাইব্রিড জাতের ফসলগুলি ভালো ফলন না পাওয়ায় দেশি জাতের ধান ও সবজির বীজ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। রাসায়নিক চাষ পদ্ধতি প্রচলন হওয়ার পরপরই দেশী প্রজাতি আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে বসেছে, বর্তমানে কৃষকরা কোম্পানীর

হাইব্রিড বীজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। চাষীরা সঠিক বীজ পায় না। ভালো মানের বীজ পায় না। এরফলে চাষীরা নানারকম সমস্যার (উৎপাদনও ক্রম হ্রাসমান) মুখোমুখি। বিঘ্ন চাষ ব্যবস্থা। বিপন্ন কৃষক সমাজ। কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে "স্বনির্ভর" থেকে (আঁধারমানিক, বাদুড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা) সংস্থার কর্মীরা গ্রামে গ্রামে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয় বিভিন্ন দেশী প্রজাতির ধান ও সবজির বীজ। অনেক মহিলা ও পুরুষকে দিয়ে দেশি বীজের বীজ ভান্ডার গড়ে তোলা হয়। হিঙ্গলগঞ্জ এরিয়া অফিসে সাংগঠনিক ভাবে একটি বীজ ভান্ডার গড়ে তোলা হয়। বীজভান্ডারে ১৭ ধরণের দেশি ধান বীজ ও ২০ ধরনের দেশী সবজি বীজ মিলিয়ে প্রায় ৪৩০ কেজি বীজ সংরক্ষণ করা হয়। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২৩০ জন কৃষক বীজ লেনদেন করেছেন। দুটি পদ্ধতিতে বীজ লেনদেন করা হয় — ১) বীজ বিক্রি ২) বীজ বিনিময় — (চাষীরা বীজ নিয়ে চাষ করার পর ফসল উঠে গেলে সেই বীজ ফেরৎ দেবে এই শর্তে)।

৬) মাটির মান উন্নয়নে কেঁচো সার, কম্পোষ্ট সার, জীবানু সার তৈরী ও ব্যবহারের প্রতি জোর দেওয়া

প্রকৃতির নিয়মে মাটিতে যথেষ্ট উপকারী জীবাণু ছিল। অত্যধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার এবং সারা বছর ধরে এক জাতীয় ফসলের চাষ করার ফলে উপকারী জীবাণুদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। এছাড়া আয়লা হওয়ার ফলে এই জীবানুদের সংখ্যা আরো দ্রুত কমে যায়। মাটির এমন পরিস্থিতি হয় যে মাটির উর্বরতা শক্তি ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার ফলে উৎপাদন দেওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে মাটির উর্বরতা শক্তি ও উৎপাদন ধরে রাখার জন্য জমিতে যথেষ্ট উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বাড়ানো জরুরী হয়ে পড়ে। অ্যাজোটোব্যাকটর, পি এস বি, রাইজোবিয়াম, ট্রাইকোডারমা ভিরিচি, কেঁচো সার, কম্পোষ্ট সার জমিতে ব্যবহার করার জন্য চাষীদের পরামর্শ দেওয়া হয়। সাথে সাথে কেঁচো সার জমিতে ব্যবহার করার জন্য চাষীদের পরামর্শ দেওয়া হয়। সাথে সাথে তাদের কেঁচো সার, কম্পোষ্ট সার, অন্যান্য জৈব সার তৈরী ও ব্যবহার হাতে কলমে শেখানো হয়।

৭) ধানগোলা (Grain Bank) ঃ

কেন ধানগোলা করা হল —

১) বছরের মধ্যে তিন মাস (ভাদ্র-কার্ত্তিক) কৃষি শ্রমিকের কাজের সুযোগ কমে যায় ফলে ঐ সময় খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

২) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে যে খাদ্যের অভাব হয়, ধানগোলা থাকলে সে সময় ধানগোলা থেকে ধান নিয়ে খাদ্যের চাহিদা মেটানো যায়।

ধানগোলা করার ফলে কি সুবিধা হল ঃ

১) মহাজনের কাছ থেকে টাকা সুদে নিতে হচ্ছে না,

২) খাদ্যাভাবে নিজেদের গোলা থেকে ঋণ হিসাবে ধান নিতে পারছেন।

৩) নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ছে।

হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে মোট ১৩ টি স্বনির্ভর দলে ১৩টি ধানগোলা তৈরী করা হয়েছে এবং এই ধানগোলা থেকে মোট ১৬১ টি বা পরিবার উপকৃত হচ্ছেন।

৮) বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ঃ

আয়লার নোনা জলে এলাকার খাল, বিল, পুকুরের জল লবণাক্ত হওয়ার ফলে তা চাষ, গরু ছাগলের পানীয় জল ও মানুষের অন্যান্য ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। বর্ষাকালে কিছুটা সবজি চাষ করা সম্ভব হলেও আশ্বিন মাস থেকে চাষ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। বর্ষাকালে পলিমারে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ঐ জল মূলতঃ শীতকালে সবজি চাষের জন্য ও গরু ছাগলের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮ X ৬ X ৩ ফুটের গর্তে যাতে বৃষ্টির জল ধরা যাবে তা দিয়ে ২ কাঠা জায়গাতে সবজি চাষ করা সম্ভব হয়েছে। হিঙ্গলগঞ্জ, পারঘুমটী ও সামসেরনগর এলাকায় ১২৪ জনের বাড়ীতে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৯) আপদকালীন ফসল চাষ ঃ

মুখিকচু, ওল, খামালু, শুশনি আলু প্রভৃতি ফসল লাগানো হয়েছে কারণ ঐ ফসলগুলি নোনা মাটিতেও ভাল হচ্ছে। এইসব ফসলের চাষ বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া যায়। সাধারণত ফসল তোলার সময় হলে ফসল তুলে ঘরে রাখা হয়। কিন্তু ঐ সব ফসল গুলি না তুলে মাটিতে রেখে দেওয়া হয় এবং যখন যখন দরকার তখন তখন তুলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলে ফসলগুলি ভালো থাকে। মাটিতে ফসল থাকাকালীন ঐ জমিতে অন্য ফসল চাষ করা সম্ভব।

১০) নোনা সহ্যকারী ফলের গাছ ঃ

লেবু, পেয়ারা, সবেদা ইত্যাদি নোনা সহ্যকারী ৩৬২ টি ফলগাছ ১৮১ জনের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

১১) বস্তায়, ভাঙা ঝুড়ি বা পাত্রে সবজি চাষ ঃ

হিঙ্গলগঞ্জ এলাকায় প্রবল বৃষ্টি বা নদী বাঁধ ভাঙনের ফলে এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। জল সরে যাওয়ার পর ফসল লাগাতে অনেক দেরি হয় ফলে ফলন ভালো হয় না। সময় মতো চারা তৈরীর জন্য পুরানো মাটির পাত্র বা ভাঙা ঝুড়িতে জৈব মাটি ভরে আগাম বীজ থেকে চারা তৈরী করা হয়। চাষীরা সময় মতো ফসল চাষ করতে পারেন।

১২) মাশরুম চাষ ঃ

মাঠে যেহেতু নোনার জন্য ভালো ফসল হচ্ছে না তখন বাড়ীতে মাশরুম চাষের জন্য প্রয়োজনীয় স্পন বিতরন করা হয়। মোট ১৮০ টি পরিবারের মধ্যে মাশরুম স্পন বিতরণ করা হয়েছে। এরা বাড়ীতে মাশরুম চাষ করেছেন।

১৩) ভেলায় ও মাচায় নার্শারী ঃ

পুরানো মাটির পাত্র বা ভাঙা ঝুড়িতে চারা তৈরীর মতো আরেকটি কৌশল হল ভেলা বা উঁচু মাচা করে তাতে মাটি দিয়ে বীজ থেকে চারা তৈরী। এলাকা জলমগ্ন থাকা অবস্থাতেও সঠিক সময়ে চারা তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

১৪) গোখাদ্যের (Fodder) জন্য ঘাস চাষ ঃ

আয়লার পরে হিঙ্গলগঞ্জে মানুষের খাদ্যের পাশাপাশি গরু ছাগলের খাদ্যেরও প্রবল ঘাটতি দেখা যায়। এ বছর গোখাদ্যের জন্য ৫৫ জনকে দীননাথ জাতের ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়েছে।

১৫) নোনা কাটানোর জন্য উঁচু বেড বা ঢিবি করে চাষ ঃ

বর্ষাকালে খুব একটা সমস্যা না হলেও বর্ষার পরপরই মাটিতে নোনার সমস্যা দেখা দেয়। ফসল ফলানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সূর্য্যের তাপে মাটির ভিতরের লবণ মাটির উপরে এসে জমা হয়। ২০০৯ সালে আয়লার পর থেকে এই সমস্যা আরো ঘনীভুত হয়। মাঠে ভালোভাবে ফসল ফলানোর জন্য সবজি চাষের জমিকে উঁচু উঁচু বেড করা শুরু হয়। বর্ষার জলে মাটির লবণ সহজে ধুয়ে যায়। এরফলে মাটিতে লবণের তীব্রতা কমে। পাশাপাশি ঐ বেডগুলিতে মালচ্ বা আচ্ছাদনের (Mulch) ব্যবস্থা করা হয়। এই সব ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে সমস্যা অনেকাংশে কমানো গেছে।

১৬) বিদ্যালয় বাগান ঃ

স্কুলগুলির মিড ডে মিলে সবজির ঘাটতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের লাগোয়া কিছুটা করে ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে সবজি চাষ করে মিড ডে মিলে সবজির ঘাটতি কিছুটা মেটানো সম্ভব। এই ভাবনা থেকে ৪টি প্রাইমারি স্কুলে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা সবজি বাগানের কাজ শুরু হয়।

১৭) দেশী বীজ উৎপাদন খামার ঃ

দেশী বীজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা ভেবে হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ৩টি জায়গায় (হিঙ্গলগঞ্জ, সামসের নগর, পারঘুটমী) বীজ উৎপাদনের জন্য ৪০ জাতের ধান ও ২৪ জাতের সবজির চাষ করা হচ্ছে। এই বীজ পরের বছর চাষীদের মধ্যে বিক্রি অথবা বিতরণ করা হবে। এই কাজটি ২০১০ সালের শুরুতে চালু হয়।

১৮) বল করে সবজি চাষ ঃ

অনেক ক্ষেত্র দেখা গেছে যে অন্যত্র চারা তৈরি করে মাঠে লাগানোর পরেও চারা বাঁচানো সম্ভব হয় না। এ ধরণের সমস্যার জন্য গোবরের ছোট ছোট বল করে প্রত্যেক বলের মধ্যে ২টি করে বীজ দেওয়া হয়। চারা বড় হলে বল সহ চারাটি মাটিতে রোপন করা হয়েছে। দেখা গেছে এভাবে রোয়া করলে কোনো চারাই নোনার জন্য মারা যায় না।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় ঃ www.swanirvarbengal.org

দূরভাষ ঃ 03217-237446

জৈব কৃষি এবং বায়ো ও বোটানিক্যাল পেষ্টিসাইড

ডঃ শুভেন্দু সেন, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী।

ভারতবর্ষে ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে, তার বহু সুফল আমরা পেয়েছি। বিভিন্ন উন্নত কৃষি প্রযুক্তির সাহায্যে উচ্চ ফলনশীল জাতের ব্যবহার, উন্নত সেচ ব্যবস্থা, প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহারের দ্বারা, একই জমিতে বছরের পর বছর একই ধরণের ফসল চক্র ইত্যাদির দ্বারা একশো কোটির উপর জনসংখ্যার অন্ন বস্ত্র যোগান দিয়ে আজ আমরা বিশ্বের অন্যতম খাদ্য উৎপাদক দেশ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছি। সেই সাথে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি বা হারাতে বসেছি। এক সময় আমরা সবুজ বিপ্লবের জন্য গর্ব বোধ করতাম, সেটা অনেকটাই আমরা আমাদের অজান্তে হারাতে বসেছি। কীটনাশকের মধ্যে শতকরা ৫২ ভাগ তুলায়, ১৩ ভাগ ধানে, ৮ ভাগ অন্য ফসলে এবং ছত্রাকনাশকের মধ্যে শতকরা ২২ ভাগ বাগিচা ফসলে, ১৮ ভাগ আলুতে, ১৩ ভাগ বাদামে, ১১ ভাগ চা বাগানে, ১১ভাগ সবজিতে ও ২৫ ভাগ অন্যান্য ফসলে ব্যবহৃত হয়।

সবুজ বিপ্লবের অপপ্রয়োগের ফলে আমরা যা হারাচ্ছি তা হলঃ

১) শুধুমাত্র রাসায়নিক সার অধিক মাত্রায় ব্যবহারের ফলে আজ মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে ফলন কমে যাচ্ছে এবং মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২) অতিরিক্ত মাত্রায় সেচের জল ব্যবহারের ফলে মাটির যেমন অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সাথে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ জলের ভান্ডার কমে যাচ্ছে, যার সুদুরপ্রসারী ফল হল পাণীয় জলের অভাব।

৩) নির্বিচারে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে উপকারী কীটপতঙ্গ, কেঁচো, ব্যাঙ, বিভিন্ন মাছ পাখি ও প্রাণী আজ বিলুপ্তির পথে।

৪) বিভিন্ন রোগ ও পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে আজ তা ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করছে।

৫) আমাদের বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে আজ কৃষি বিষের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে।

৬) পরিবেশে জল, মাটি ও বাতাস দুষিত হচ্ছে, বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে ও তার ফলে আজ আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপন্ন হচ্ছে।

৭) উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাত চাষের ফলে আমাদের দেশীয় বা নিজস্ব জাত নষ্ট হচ্ছে।

৮) চাষের খরচ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে অপরদিকে ফলন কমে যাচ্ছে। অথচ এই বিস্ফোরিত জনসংখ্যার মুখে অন্ন যোগাতে ও এই বিপদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জ্য সুসংহত উপায়ে ফসল ফলানো বা Intergated Crop & Farm Management এর উপরে জোর দিতে হবে যার প্রধান স্তম্ভ হল চিরস্থায়ী কৃষি (Sustainable Agriculture) বা জৈব কৃষি (Organic Farming) জৈব কৃষির একটি বড় স্তম্ভ হল জৈব ও জীবাণু সার (Bio Fertilizer) এবং জৈব ও জীবাণু কৃষি বিষ (Bio & Botanical Pesticide) এর ব্যবহার।

ফসলের বিভিন্ন ক্ষতিকারক রোগপোকা নিয়ন্ত্রন ও দমনের জন্য বিভিন্ন জৈব জাত পদার্থ বা জীবাণু বা বন্ধু পোকা প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়। যে সব জৈব, জীবাণু বা বন্ধু পোকা ফসল রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয় তাদের জৈব ও জীবাণু কৃষি বিষ বলা হয়।

এদের মধ্যে গাছপালা থেকে প্রাপ্ত নির্যাস যেমন নিম, তামাক, ধুতরো, চন্দ্রমল্লিকা, করঞ্জা প্রভৃতি গাছের নির্যাস থেকে কীটনাশক তৈরী করা হয়। অনেক দেশী ও বিদেশী সংস্থা এদিকে নজর দিচ্ছে যার ফলে রিপেলিন, নিমগোল্ড , নিমিন ইত্যাদি বাজারে এসেছে ও

তাদের কার্যকারিতা মানুষের মধ্যে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। এগুলি রাসায়নিক ভাবে সুস্থিত, আলোক সংবেদনশীল নয়। গুদামজাত করে রাখার সুবিধা আছে। সবথেকে বড় সুবিধা হলো এগুলির কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই ও পরিবেশ অনুকূল কীটনাশক।

এছাড়াও রসুন ও পেঁয়াজ পাতার রস, হলুদ, লঙ্কার রস, নিসিন্দা , আতা, বাসক ইত্যাদির রস ফসল রক্ষায় ব্যবহার হচ্ছে।এগুলি সবই বোটানিক্যাল পেষ্টিসাইড।

ঘরে তৈরি কীটনাশকঃ

ক) **নিমবীজের নির্যাস ঃ** ৭৫ গ্রাম খোসাসহ নিম বীজ গুড়ো করে, ১ টা মিহি কাপড়ে বেঁধে ১ লিটার জলে সারারাত রেখে চেপে নিতে হবে। বীজের দ্রবণের সাথে অর্ধেক পরিমান তরল সাবান ও ১ চামচ তিলতেল মিশিয়ে বিকালে স্প্রে করতে হবে।

খ) **নিমবীজ পাউডার ঃ** ১ কেজি নিমবীজ পাউডার ২০ লিটার জলে সারারাত ভিজিয়ে ছেঁকে তরল সাবান মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

গ) **নিমখোলের নির্যাস ঃ** ১০০ গ্রাম নিমখোল ১লিটার জলে ১২ ঘন্টা চটকে, ছেঁকে নিয়ে আধ চামচ তরল সাবান মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ঘ) **নিমতেলের নির্যাস ঃ** ৩০ মিলি নিমতেলে ১লিটার জলে মিশিয়ে আধ চামচ তরল সাবান মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ঙ) **নিমপাতার নির্যাস ঃ** ১ কিলো কাঁচা নিমপাতা থেঁতো করে ১২ ঘন্টা ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে ছেঁকে ২ চামচ তরল সাবান মিশিয়ে স্প্রে। ১ বিঘার জন্য ৬০ লিটার জল ও ১২ কেজি কাঁচা নিমপাতা প্রয়োজন।

চ) **আতাপাতার নির্যাসঃ** ১০০ গ্রাম টাটকা আতাপাতা কুচিয়ে নিয়ে ১ লিটার জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এক চামচ নরম সাবান মিশিয়ে বিকালের দিকে স্প্রে করতে হবে।

এছাড়াও প্রাকৃতিক বিভিন্ন জীবাণু - যেমন ছত্রাক দিয়ে তৈরী ট্রাইকোডারমা গাছের ছত্রাক ঘটিত শিকড় পঁচা ও গোড়া রোগ নিয়ন্ত্রন করা যায়। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া যেমন ব্যাসিলাস থুরানজিনসিস দিয়ে লেদা পোকা এবং এন. পি. ভি ভাইরাস দিয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন রকম পরজীবি ও পরভোজী বন্ধু পোকা, মাকড়সা, বোলতা বিভিন্ন ধরণের ফসল সুরক্ষায় ব্যবহার করা যায়।

বায়োপেষ্টিসাইডের ব্যবহারের সতর্কতা ঃ

১) যেহেতু বায়োপেষ্টিসাইড জীবন্ত কোষ তাই এদের ব্যবহারের ৭ দিন পূর্বে বা পরে জমিতে কোনো রাসায়নিক কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যাবে না।

২) জমিতে কোনো রাসায়নিক সার বা চুণ ব্যবহার করা যাবে না।

৩) যেহেতু এগুলি জীবন্ত , তাই এগুলির খাদ্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ ও জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। কারণ জৈব পদার্থ ছাড়া এরা বেঁচে থাকতে পারবে না। তবে মাটি বেশী আম্লিক হলেও এরা বাঁচতে পারবে না।

৪) ব্যবহারের সময় মাটি ভিজে থাকা প্রয়োজন।

৫) ব্যবহারের সময় পাত্রটিকে, যাহার মধ্যে কীটনাশক আছে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে।

৬) খুব গরম বা ঠান্ডায় এরা ভালোভাবে কাজ করতে পারে না।

৭) প্রখর সূর্যের আলোয় এদের না রাখাই ভালো। বিকালের দিকে গুড় গুলে আঠার সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা ভালো

৮) বায়ো ও বোটানিক পেষ্টিসাইড বর্তমানে ভারতীয় কীটনাশক আইন ১৯৬৮ তে রেজিষ্ট্রেশান ভূক্ত। তাই ব্যাচ নং, তৈরীর তারিখ ও মেয়াদকাল উল্লেখ ছাড়া এই জাতীয় কোনো পেষ্টিসাইড ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রধান ও উপ-প্রধানের অপসারণ

গৌতম সান্যাল, অনুষদ সদস্য, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যমান সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা এই উদ্দেশ্যে আহূত বিশেষ সভায় প্রধান ও উপ-প্রধানের অপসারণ করা যায়।

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যমান সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ (কমপক্ষে ৩ জন) সদস্যকে প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারণের জন্য অনাস্থা জ্ঞাপন করে লিখিত পত্র পেশ করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে অপসারণকারী সদস্যদের যে তিনটি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে তা হল ঃ

১) অনাস্থা পত্রে তাঁদের দলীয় অবস্থান স্পষ্ট উল্লেখ করতে হয়।

২) অনাস্থা পত্রটি হয় সশরীরে অথবা রেজিস্টার্ড পোস্টে সরাসরি বিডিও-র নিকট পাঠাতে হয়।

৩) অনাস্থা পত্রটি যাঁর উদ্দেশ্যে একটি কপি তাঁর কার্যালয়ে এবং আরেকটি কটি তাঁর বাড়ির ঠিকানায় পাঠাতে হয়।

এরপর প্রজ্ঞাপিত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিডিও-এর ভূমিকা ঃ

(১) প্রথমত তাঁকে এটি নিশ্চিত হতে হয় যে, পূর্বে বর্ণিত তিনটি শর্ত যথাযথভাবে পালিত হয়েছে।

(২) অনাস্থা জ্ঞাপকপত্র প্রাপ্তির ৫টি কাজের দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ সভার নোটিশ জারি করতে হয়।

(৩) ঐ নোটিশে বিশেষ সভাটির সময় ও তারিখ উল্লেখ করে তা পরিষ্কার সাতদিন আগে জারি করতে হয়।

(৪) অনাস্থা জ্ঞাপক পত্র প্রাপ্তির ১৫টি কাজের দিনের মধ্যেই ঐ বিশেষ সভাটি অনুষ্ঠিত করতে হবে।

(৫) এই সভা একবার আহ্বান করা হলে কেবলমাত্র মহামান্য আদালতের কোন আদেশ ব্যতীত অথবা তাঁর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে কোনভাবেই স্থগিত বা বাতিল কোনটাই করা যায় না।

(৬) এই সভা পরিচালনা করার জন্য তাঁকে একজন সরকারি আধিকারিককে প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করতে হয়।

প্রিসাইডিং অফিসারের ভূমিকা ঃ

(১) প্রত্যেক সদস্যই সভার নোটিশ ঠিক ঠিক পেয়েছেন এটি সভার শুরুতেই তাঁকে নিশ্চিত হয়ে নিতে হয়।

(২) বিদ্যমান সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদের অর্ধেকের বেশী সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হলে সভার কোরাম সম্পূর্ণ হয়। তা হয়েছে কিনা তাঁকে দেখে নিতে হবে।

(৩) তাঁর কোন ভোটাধিকার নেই। তবে সভায় কোন বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তিনি তাঁর নিজের মতামত কোনভাবেই না প্রকাশ করে সেই ব্যাখ্যাটুকু দিতে পারেন।

সভা ঃ

(১) সভায় সর্বসম্মতি না ঘটলে খোলা ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাভুটি করতে হবে।

(২) ব্যালট পেপারের উল্টো পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট সদস্যকে পুরো সই করতে হবে বা আঙুলের টিপছাপ লাগাতে হবে। টিপছাপ দিলে সেটি তাঁর দলের দলনেতা অথবা প্রিসাইডিং অফিসার নিজে প্রত্যয়িত করে দেবেন।

সভার কার্যাবলী ঃ

(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব অথবা তার অবর্তমানে প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক নিয়োজিত কোন কর্মচারী সভার কার্যবিবরণী লিখবেন।

(২) কার্যবিবরণীতে উপস্থিত সদস্যদের নাম, কোন কোন সদস্য অনাস্থার পক্ষে এবং কোন কোন সদস্য বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন (যদি ভোটাভুটি হয়ে থাকে) তা স্পষ্ট করে লিখতে হবে। কি পদ্ধতিতে সভাটি অনুষ্ঠিত হল তাও পরিষ্কার করে লিখতে হবে।

(৩) কার্যবিবরণীর শেষে লেখক এবং প্রিসাইডিং অফিসার উভয়কেই স্বাক্ষর করতে হবে।

(৪) এরপর সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শোনাতে হবে এবং তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে পাঠশেষে উপস্থিত সদস্যগণ আবার তাতে সই করবেন।

(৫) এরপর যদি কোন সদস্য সই করতে অস্বীকার করেন বা আগে সভা ছেড়ে চলে গিয়ে থাকেন তাঁদের নাম উল্লেখ করে প্রিসাইডিং অফিসার ঐ কার্যবিবরণীর একটি কপি সংগ্রহ করে চলে আসবেন।

রিপোর্ট পেশ ঃ

(১) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক (অবর্তমানে, সচিব) এই সভার কার্যবিবরণী সভা হওয়ায় পরবর্তী তিনটি কাজের দিনের মধ্যে বিডিও-র নিকট প্রেরণ করবেন।

(২) ঐ একই সময়ের মধ্যে প্রিসাইডিং অফিসারও তাঁর তৈরি একটি রির্পোট সহ কার্যবিবরণীর একটি কপি বিডিও-র নিকট প্রেরণ করবেন।

ফলাফল ঃ

রিপোর্ট ও সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ৫ দিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত ফলাফল বিডিওকে যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে জানাতে হবে। এবং এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি তাঁকে জ্ঞাপক পত্র প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

সীমাবদ্ধতা ঃ

(১) সংখ্যগরিষ্ঠের ভোটে অনাস্থাটি গৃহীত না হলে অথবা সভাটিই কোরামের অভাবে আদৌ অনুষ্ঠিত না হলে সভার তারিখের এক বছর সময়সীমার মধ্যে ঐ একই ব্যক্তির অপসারণের জন্য আর কোন অনাস্থা আনা যাবে না।

(২) পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন-পরবর্তী প্রথম সভা অথবা পরবর্তী কোন সভায় নির্বাচিত প্রধান বা উপ-প্রধানের অপসারণের জন্য ঐ নির্বাচনের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা আনা যাবে না।

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে। তবে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারি সভাপতির অপসারণের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপিত কর্তৃপক্ষ হলেন এস.ডি.ও. অথবা অতিরিক্ত এস.ডি.ও. এবং জেলা পরিষদে সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতির অপসারণের ক্ষেত্রে তিনি হবেন বিভাগীয় কমিশনার।

N.B. : For any action to be taken in this respect, THE WEST BENGAI PANCHAYAT (AMENDMENT) ACT, 2010 (West Bengal Act VIII of 2010], published in the Kolkata Gazette dated Thursday, May 13, 2010, vide Law Department's Notification No. 651-L.-13th May, 2010, which came into force since 01.07.2010 [vide P & RD's Notification No. 3119 / PN / O I/1A-3/2010 dtr. 17.06.2010] is to be followed mutatis mutandis.

মেয়েদের পাতা - সামাজিক লিঙ্গবৈষম্য ও মানবী বিদ্যা বিভাগ, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, পশ্চিমবাংলা।

রাজ্যের প্রথম মহিলা সংসদ

বউ বেটা দেখে না আমায়, কোথায় বলি বলো?
বর আমায় পিটায় জানো, কোথায় বলি বলো?
বাচ্চাগুলো ভাত পায়না, কোথায় বলি বলো?
ইস্কুলেতে পাইনি যেতে, কোথায় বলি বলো?
বুকের ব্যথা, প্রাণের কথা, কোথয় বলি বলো?
সবাই মিলে তাইতে আজ মহিলা সংসদ চলো।।

রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে এরাজ্যের প্রথম মহিলা সংসদ সংগঠিত হয়ে

গেছে ২০১০ সালের ১০ই মে ও ১১ই মে তারিখ বাঁকুড়া জেলার জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির ময়নাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। মহিলা সংসদ হল শুধুমাত্র মহিলা ভোটারদের নিয়ে সংসদ সভা, যা শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রথম করা হয়েছে এবং এই সংক্রান্ত বিলও আনা হয়েছে। পঞ্চায়েত বিশেষজ্ঞরা মহিলা সংসদের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন ধরেই উপলব্ধি করেছিলেন উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরীর স্বার্থে। কিন্তু তা এতদিন বাস্তবায়িত করা যায়নি।

আলাদা করে মহিলা ভোটারদের নিয়ে সংসদ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন। আসলে আমাদের রাজ্যে বছরে দুবার সংসদ করার নিয়ম থাকলেও অনেক জায়গায় সফল সংসদ হয়না, হলেও উপস্থিতির সংখ্যা খুব কম। আবার যেখানে মানুষ যায়, মহিলাদের উপস্থিতি সেখানে কম। আবার যেসব মহিলা উপস্থিত থাকেন, তাদের অধিকাংশই পুরুষদের উপস্থিতিতে মুখ খুলতে চান না .... ফলে পরিকল্পনায় মহিলাদের মতামত বা তাদের প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা সঠিকভাবে ধরা যায় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই প্রতিটি গ্রাম সংসদের আগে আলাদা করে মহিলা সংসদ করা দরকরা যাতে গ্রামের উন্নয়নে শুধুমাত্র পুরুষদের একপেশে চিন্তাভাবনা না থাকে, তার সঙ্গে যেন মহিলাদের চিন্তাভাবনাও প্রতিফলিত হতে পারে। পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গী যে একে অন্যের পরিপূরক তা উঠে এসেছে ময়নাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা সংসদের অভিজ্ঞতা থেকে।

ময়নাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতী মমতা বাগদির উৎসাহে, সকল সদস্যদের সহযোগিতায় এবং রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থার পরিচালনায় পরীক্ষামূলকভাবে দুটি সংসদ, যথাক্রমে আশুরালি দক্ষিণপাড়া ও কুসুমা দীঘিতে প্রথমদিন মহিলা সংসদ এবং ঠিক তার পরের দিনই গ্রাম সংসদ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই মহিলা সংসদের একবছর আগে থেকে প্রস্তুতি চলেছিল রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে সংসদগুলিতে ঘুরে ঘুরে মানুষের সমর্থন যোগাড় করে ও প্রতিটি বাড়ি বাড়ি ঘুরে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের আস্থা অর্জন করা। দুটি সংসদ সভাই বিপুলভাবে সফল হয়েছিল — আশুরালি দক্ষিণপাড়ার ৯টি পাড়ার ৪৯১ জন মহিলা ভোটারের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন ৩১০ জন (৬৩ শতাংশ) আর ঘোড়াডুবি-কুসুমদীঘি সংসদের ৭টি পাড়ার ৪০৫ জন মহিলা ভোটারের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন ২৮২ জন (৬৯ শতাংশ। দুটি সংসদেই মহিলাদের আলোচনার মধ্যে বিভিন্ন দাবী দাওয়া (বিপিএল কার্ড, ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ী, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি) ছাড়া গ্রামের উন্নয়ন ও তার সমাধানের বিষয়ে যেসব প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তা সত্যিই চমকপ্রদ। যেমন, একশদিনের কাজে যেসব পুকুর খনন বা সংস্কার হয়েছে, ৬০-৪০ ব্যয়ের অনুপাত মেনে তার চারদিকে ঘাট বাঁধাই করার দাবী করেছেন মহিলারা কারণ গ্রামের মহিলাদের বেশীরভাগ সময় কাটে জলকে কেন্দ্র করে পুকুরঘাটে। অনেকেই বলেছেন ঘাটে আড়াল তৈরী করার জন্য যাতে আব্রু রক্ষাও হয় আবার স্বাস্থ্যের কারণে ভেজা কাপড়ে না থাকতে হয়। উঠে এসেছে কত নতুন নতুন ভাবনাচিন্তা — জলের উৎসের জায়গায় কলসহ জলাধার (ট্যাঙ্ক) তৈরীর প্রস্তাব, অঙ্গন-ওয়াড়ী কেন্দ্রের চারপাশের মাঠে সবজি লাগানোর প্রস্তাব, স্বনির্ভর দলগুলি লিজ নিয়ে যেসব পুকুরে মাছ চাষ করে সেখান থেকে উৎপাদনের ১০ শতাংশ মাছ নিয়ে মিড-ডে-মিলে বাচ্চাদের খাওয়ানো, এলাকায় স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে অটোরিক্সা চালু করে বাচ্চাদের ইস্কুল যাওয়ার সমস্যার সমাধান ইত্যাদি। প্রতিটি প্রস্তাবই পুরুষরা পরেরদিন গ্রাম সংসদে মেনে নিয়েছেন সানন্দে এবং জানিয়েছেন যে বিষয়গুলিকে এভাবে তারা আগে কখনো ভেবে দেখেননি। সংসদ থেকে উঠে আসা প্রস্তাবগুলির অনেকগুলি গ্রামপঞ্চায়েত তার আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে রূপায়িত করেছে।

ময়নাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই মহিলা সংসদ হওয়ার পরে প্রায় একবছর হয়ে গেছে — ইতিমধ্যে মহিলা সংসদ হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অধীন বেলবাড়ি - ২ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতী মঙ্গলা রায়ের নেতৃত্বে আর জলপাইগুড়ি জেলার মাটিয়ালী ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতী ভারতী দেবীর নেতৃত্বে। মহিলা তথা এলকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে মহিলা সংসদের কোনও বিকল্প নেই।

পঞ্চায়েতের তিন কন্যার কাহিনী

● আমার নাম দেবী প্রধান — জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশু ও নারী উন্নয়ন উপসমিতির সঞ্চালক। ২০০৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়াই এবং আমাকে এলাকার মানুষ তাঁদের আশীর্বাদে ধন্য করেন। আমার ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত কষ্টের ও দুঃখের। শুধুমাত্র আনন্দের জায়গা আমার গান লিখে গান গাওয়া। নেপালী পরিবারের মেয়ে হয়ে যেভাবে আমাকে জীবন যুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে বা আজও লড়াই করতে হচ্ছে, তা বলার কথা নয়। আমি সামান্য অঙ্গন-

ওয়াড়ীর কর্মী হয়ে দুই মেয়েকে একা লড়াই করে বড় করেছি, উচ্চশিক্ষিত করেছি। পঞ্চায়েতের জীবনেও সেই লড়াই আমার পিছু ছাড়েনি। গ্রাম পঞ্চায়েতে এসেই দেখলাম, এখানেও সেই পুরুষতন্ত্র — গ্রাম পঞ্চায়েতে সেক্রেটারীর কথাই শেষ কথা, তার দাপটে আমরা মহিলা সদস্যরা জেরবার। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতে আছেন বারোবছরের উপর। তিনি তার ইচ্ছেমতো আসবেন-যাবেন, তার ইচ্ছেমতো বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করাবেন, তার ইচ্ছেমতো আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন, তার ইচ্ছেমতো উপসমিতির মিটিং ডাকবেন না, তার ইচ্ছেমতো নিয়ম কানুন গোপন করবেন — এমনকি প্রধান সাহেব শ্রীমতী লছমী সাবরও জানতেন না যে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার তিনিই দেখার অধিকারী। গ্রাম পঞ্চায়েতের সব নিয়ম কানুন আমরা জানতে পারলাম এস আই পি আর ডি থেকে আসা টীমের প্রশিক্ষণে গিয়ে। " পঞ্চায়েত মহিলা এবং যুব শক্তি অভিযানের" এই প্রশিক্ষণ থেকে আমরা জানতে পারলাম আমাদের অ্যাসোসিয়েশন করার সুযোগের কথা। আমাদের চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যাসোসিয়েশন হল পশ্চিমবাংলায় প্রথম মহিলা অ্যাসোসিয়েশন। আর সেই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম দাবী ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের সুষ্ঠু কাজের জন্য সেক্রেটারীর অপসারণ। জেলার জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকের কাছে সব কিছু জানিয়ে আমরা প্রতিবেদন পাঠাই এবং তার কপি পাঠিয়ে দিই বিডিও সাহেবের কাছে আর এস.ডি. ও সাহেবের কাছে, এই খবর জানার পরে শুরু হয় আমাদের উপর নানা রকম চাপ, ভয় দেখানো। আমার উপরে ভীষণভাবে শুরু হয় মানসিক অত্যাচার। কিন্তু আমি পিছু হঠিনি। বারবার আবেদন করতে থাকি অফিসারদের কাছে। অবশেষে জয় হয় মহিলাশক্তির — বদলি করা হয় দীর্ঘদিনের সেক্রেটারীকে। আমরা এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি, মুক্ত মনে কাজ করি আর ফিরে পেয়েছি আমাদের মনোবল। জয় অ্যাসোসিয়েশন, জয় "পঞ্চায়েত মহিলা এবং যুবশক্তি অভিযান"। এই আনন্দে লিখে ফেলেছি গান — 'জাগো মহিলাদের দল, তোমরা না জাগিলে মাগো দেশের অমঙ্গল'।

● আমি এক গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা। আমি যদিও এই প্রথম পঞ্চায়েতে এসেছি, কিন্তু কিছু কাজ করব এই ইচ্ছেয় এসেছিলাম। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত হল স্বায়ত্ব শাসিত সরকার, কিন্তু তার সদস্যরা কতটা স্বায়ত্ত আর কতটা অধীনস্থ, তারই গল্প আজকে আপনাদের বলব। সম্প্রতি আমাদের সকল সদস্যকে কিছু কিছু রেশনকার্ড ভাগ করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সঠিকভাবে বিলি বন্টন করার জন্য। আমি সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার পর সিদ্ধান্ত নিই যে, আমার সংসদের ১৮ বছর বা তার বেশি যে বাসিন্দার এখনো রেশনকার্ড হয়নি, তাদেরকেই কার্ড বিলি করব কারণ গ্রাম পঞ্চায়েতে জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রি করার দৌলতে এখন ছোটো বাচ্চাদের রেশনকার্ড পেতে খুব একট অসুবিধা হবেনা, কিন্তু অসুবিধা হবে বেশী বয়সের বাচ্চাদের। এই সিদ্ধান্ত থেকে আমি বিলি করতেও শুরু করি, কিন্তু আপত্তি আসে সহযোগিদের থেকে। কিন্তু আমি অটল থাকি আমার সিদ্ধান্তে। তাতে আমি বেশ অসুবিধার মুখে পড়ি। ইতিমধ্যে ওনারা আরো বাধ সাধলেন একটি মেয়েকে নিয়ে। গরীব মানুষের মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়েছে — গ্রাম ছেড়ে মেয়েটি চলে যাবে অন্য গ্রামে। বাবা-মা হাতে পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করছে, এখানে রেশন কার্ড হয়ে গেলে পরে শ্বশুরবাড়িতে বদলি করে নিয়ে গেলেই সুবিধা। কিন্তু এখানে যদি আর না হয়, তবে শ্বশুরবাড়ীর দেশে আর হবে না ইত্যাদি ,ইত্যাদি। ফলে আমার মনে হল, গরীব মেয়েটির এইটুকু উপকার যদি করা যায়, তবেই তো আমার পঞ্চায়েতে আসার সার্থকতা! মেয়েটি কার্ড পেল। তারপর থেকে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির লোকেরা আমাকেএড়িয়ে চলে, আমার সংসদের আরেকজন যিনি সদস্যা আছেন (কনিষ্ঠ), তাকে দিয়ে কাজ করায়। যারা এরকম করলেন তারা দল আর পঞ্চায়েতের মধ্যে ভেদটা জানেন না বা বোঝেন না। যতক্ষণ না রেজল্যুশন করে আমাকে আমার গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভাপতিত্ব থেকে বাতিল করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমিই সভাপতি। এইসব মানুষ দলের নামে গণতন্ত্রকে অপমান করছেন, কামনা করি তাদের অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে দ্রুত বেড়িয়ে আসার।

● আমার নাম শ্রীমতী মমতা বাগদী। আমি বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের ময়নাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়েই গ্রামীণ সমাজের রীতি মেনে আমার বিয়ে হয়ে যায় — তারপরে আমি মাধ্যমিক পাশ করি। তারপরে আমার ইচ্ছে থাকলেও পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে আর লেখাপড়া বেশীদূর এগোয়নি। এরপরে হঠাৎ করেই গ্রামের মানুষের ইচ্ছায় আমি পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়াই এবং ১৯৯৮ সালে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হয়ে কাজ করি। সেই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে এবং গ্রামের মানুষের উৎসাহে আবার ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়াই এবং সবাই আমাকে প্রধান পদে মনোনীত করেন। মানুষের আশীর্বাদে ও সকলের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ভালো ভাবেই কাজ করেছি। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে এই রাজ্যের প্রথম মহিলা সংসদ হয়ে গেছে ২০১০ সালে। মহিলাদের ইচ্ছে তালিকার সবকিছু করা সম্ভব হয়নি টাকার অভাবে। তবু তার মধ্যে অনেক কিছুই করা গেছে। ইতিমধ্যে রাজনীতিতে পালাবদল হয়ে গেছে — শুনছি রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় চলছে বিভিন্ন অস্থিরতা। আমাদের এখানেও শুরু হয়েছিল এরকমই কিছু কিছু বিক্ষোভ, অস্থিরতা। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ কোনো খারাপ আচরণ করা বা বিবাদ করা, এমন কিছু করেননি।

পালাবদলের পরপরই আমরা আমাদের এখানে সবাই মিলে একসঙ্গে বসেছিলাম, কারণ পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সম্পর্কে বিরোধীদের মধ্যে নানারকম ধোঁয়াশা বা অস্বচ্ছ ধারণা ছিল। বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে বারবার বসেছি, মিটিং করেছি। গ্রাম পঞ্চায়েতে যেসব স্কীমের কাজ সরাসরি হয়, সেগুলি সম্পর্কে ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। যেমন ধরুন, একশ দিনের কাজ নিয়ে, এটার নিয়ম-কানুন ইত্যাদি নিয়ে বারবার আলোচনা করেছি। ফলে ওনারাও বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হলেও, লক্ষ্য এক — তা হল গ্রামের উন্নয়ন। এইভাবেই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি কিছু করার স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

অনুলিখন ঃ সুপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, বরিষ্ঠ অনুষদ সদস্য
রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা , কল্যাণী

একনজরে ২০১১ এর জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গের কিছু পরিসংখ্যান

সংকলনঃ শ্রী দীপক কুমার শীল, গ্রন্থাগারিক, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ সংস্থা, কল্যাণী।

জেলার সংখ্যা		১৯টি
ব্লক		৩৪১টি
গ্রাম		৪০,২০৩ টি
শহর		৯০৯ টি
বিধিবদ্ধ শহর (স্ট্যাটুইটারি টাউন)		১২৯ টি
জনগণনা শহর (সেনসাস টাউন)		৭৮০ টি
মোট আয়তন		৮৮,৭৫২ বর্গ কি.মি.
মোট জনসংখ্যা	মোট ৯১,৩৪৭,৭৩৬ জন	গ্রাম ঃ ৬২,২১৩,৬৭৬ জন শহর ঃ ২৯,১৩৪,০৬০ জন
	পুরুষ ঃ ৪৬,৯২৭,৩৮৯ জন	গ্রাম ঃ ৩১,৯০৪,১৪৪ জন শহর ঃ ১৫,০২৩,২৪৫ জন
	মহিলা ৪৪,৪২০,৩৪৭ জন	গ্রাম ঃ ৩০,৩০৯,৫৩২ জন শহর ঃ ১৪,১১০,৮১৫ জন
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.-এ)		১০২৯ জন
নারী পুরুষের অনুপাত (প্রতি ১০০০ জন পুরুষের প্রেক্ষিতে নারীর সংখ্যা	৯৪৭ জন	গ্রাম ঃ ৯৫০ জন শহর ঃ ৯৩৯ জন
০-৬ এর জনসংখ্যা	মোট ঃ ১০,১১২,৫৯৯ জন	গ্রাম ঃ ৭৫৩৫২২৮ জন শহর ঃ ২৫৭৭৩৭১ জন
	পুরুষ ঃ ৫,১৮৭,২৬৪ জন	গ্রাম ঃ ৩,৮৬০,৯৫৮ জন শহর ঃ ১,৩২৬,৩০৬ জন
	মহিল ঃ ৪,৯২৫,৩৩৫ জন	গ্রাম ঃ ৩,৬৭৪,২৭০ জন শহর ঃ ১,২৫১,০৬৫ জন
সাক্ষর জনগণ	মোট ঃ ৬২,৬১৪,৫৫৬ জন (৭৭.০৮ শতাংশ)	গ্রাম ঃ ৩৯,৮৯৮,১৮৭ জন শহর ঃ ২২,৭১৬,৩৬৯ জন
	পুরুষ ঃ ৩৪,৫০৮,১৫৯ জন (৮২.৬৭%)	গ্রাম ঃ ২২,২৯৮,০২২ জন শহর ঃ ১২,২১০,১৩৭ জন
	মহিলা ঃ ২৮,১০৬,৩৯৭জন (৭১.১৬%)	গ্রাম ঃ ১৭,৬০০,১৬৫ জন শহর ঃ ১০,৫০৬,২৩২ জন

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ - পুনর্গঠিত ব্যবস্থা

গায়ত্রী বসু, বরিষ্ঠ অনুষদ সদস্যা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এখনও এ সম্পর্কে অনেকের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। যদিও স্কুলে ভর্তি বা রেশন কার্ড করার প্রয়োজনে জন্ম নিবন্ধীকরণ করা হয়, কিন্তু মৃত্যু নিবন্ধীকরণ সেই হিসেবে ততটা গুরুত্ব পায় না। জন্ম-মৃত্যু ও মৃতজাতের নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হল।

বর্তমানে সারা পশ্চিমবঙ্গে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ আইন ১৯৬১ এবং জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ বিধি ২০০০ অনুযায়ী জন্ম, মৃত্যু ও মৃতজাতের নিবন্ধীকরণের যাবতীয় কাজ করার ক্ষেত্রে রাজ্য, জেলা, মিউনিসিপ্যালিটি, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতেই সংগঠিত হবে।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ কেন?	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ আইন ১৯৬৯ অনুযায়ী প্রতিটি জন্ম, মৃত্যু নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। স্কুলে ভর্তি, পাশপোর্ট সংগ্রহ, রেশনকার্ড, ভোটাধিকার, বিমাকরণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স, চাকরিতে নিয়োগ ইত্যাদি নানা ব্যক্তিগত কাজের জন্য জন্মের প্রমাণ পত্রের প্রয়োজন। বিমা ও পেনশনের নিষ্পত্তি, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত টাকার দাবী আদায় ইত্যাদি নানা কাজের জন্য মৃত্যুর প্রমাণপত্রের দরকার তাছাড়াও জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যার সঠিক চিত্র জানা, শিশুদের রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ অত্যন্ত জরুরী। সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করা, ভোটের তালিকা থেকে মৃত ব্যক্তির নাম বাতিল করা ইত্যাদি নানা কাজের জন্য জন্ম-মৃত্যুর প্রমাণপত্রের দরকার।	
কতদিনের মধ্যে খবর দিতে হবে?	প্রতিটি জন্ম-মৃত্যু ২১ দিনের মধ্যে জানাতে হবে। একে স্বাভাবিক বা নর্মাল রেজিস্ট্রেশন বলা হয়। যদি জন্ম-মৃত্যুর খবর ২১ দিনের মধ্যে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে গ্রামাঞ্চলে গ্রাম প্রধানের কার্যালয় থেকে বিনামূল্যে প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা যাবে। ঐ সীমা অতিক্রম করলে একে বিলম্বিত পঞ্জিকরণ বা ডিলেইড রেজিস্ট্রেশন বলা হবে। জন্ম বা মৃত্যুর ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধীকরণ করলে বিনামূল্যে প্রমাণপত্র পাওয়া যায় কিন্তু বিলম্বিত পঞ্জিকরণ বা ডিলেইড রেজিস্ট্রেশন হলে লেট ফাইন সহ প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে হবে।	
কার কাছে জন্ম-মৃত্যুর খবর দিতে হবে ?	যে স্থানে জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে সেই স্থানের সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন দপ্তরে তা পঞ্জিকরণ হবে। গ্রামাঞ্চলে ঃ স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে। শহরাঞ্চলে ঃ মিউনিসিপ্যালিটি বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, নোটিফায়েড এরিয়া, ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া ইত্যাদি অফিসের স্থানীয় রেজিস্ট্রারকে।	
কে জন্ম-মৃত্যুর খবর দেবেন (সংবাদদাতা কে হবেন)?	বসতবাড়ী	পরিবারের প্রধান। তার অনুপস্থিতিতে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা আত্মীয়া
	হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতিসদন বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান	ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার বা তার অনুমোদিত কোন ব্যক্তি।
	বোর্ডিং, লজ, ধর্মশালা, সর্বজনীন আবাসস্থল	সেখানকার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
	প্রকাশ্য স্থান	গ্রামাঞ্চলে ঃ গ্রামের প্রধান ব্যক্তি এবং শহরাঞ্চলে ঃ থানার পুলিশ অফিসার-ইন-চার্জ
	কারাগার বা কয়েদখানা	ভারপ্রাপ্ত কারাপাল (জেল)
	বাগিচা	বাগিচার সুপারিনটেনডেন্ট

নথিভুক্ত ঘটনার অনুসন্ধান কিভাবে?	যেকোনও ব্যক্তি যে কোন জন্ম বা মৃত্যুর প্রমাণপত্রের জন্য উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে আবেদন করতে পারেন আবেদন পত্রে যদি নিবন্ধীকরণের সঠিক তারিখ থাকে তবে কোনও অনুসন্ধান মূল্য লাগে না। সঠিক তারিখের অভাবে যে বছরের জন্য অনুসন্ধান করানো হবে সেই নির্দিষ্ট বছরের জন্য ২ টাকা অনুসন্ধান মূল্য (সার্চ ফি) লাগে। সেই নির্দিষ্ট বছরে ঘটনাটি নথিভুক্ত না থাকলে পরবর্তী যে বছর বা বছরগুলির জন্য অনুসন্ধান করানো হবে সেক্ষেত্রে প্রতি বছরের জন্য ২ টাকা করে সার্চ ফি লাগবে।
জন্মের প্রমানপত্রের শিশুর নাম ছাড়া নথিভুক্ত হলে পরবর্তীকালে শিশুর নাম জন্মের প্রমানপত্রের উল্লেখের কি ব্যবস্থা রয়েছে?	শিশুর জন্ম নাম ছাড়া নথিভুক্ত হয়ে থাকলে, নথিভুক্ত করার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে শিশুর পিতা, মাতা বা অভিভাবক আবেদন করবেন। আবেদনের ভিত্তিতে শিশুর নাম প্রমাণপত্রে লেখানো যায়। এর জন্য কোনও মূল্য লাগবে না। এক বছর পার হয়ে গেলে ৫ টাকা লেট ফি দিয়ে শিশুর নাম প্রমাণপত্রে লেখানো যায়।
নথিভুক্ত ঘটনার সংশোধন অথবা বাতিল করা যায় কি?	কোন ঘটনা নথিভুক্ত করার সময় সাধারণ কিছু ভুল থাকলে রেজিষ্ট্রার / সাব রেজিষ্ট্রার ঘটনাটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হলে তিনি নিজেই তা সংশোধন করতে পারেন। রেজিষ্ট্রার / সাব রেজিস্ট্রার দুজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবৃতি গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখে সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে পারেন। কোন ঘটনা ভুলক্রমে নথিভুক্ত হয়ে থাকলে তিনি তা বাতিল করতে পারেন।
অন্য রাজ্যে জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে প্রমাণপত্র কিভাবেপাওয়া যায়?	সারা ভারতে জন্ম মৃত্যুর আইন একই সুতরাং জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনাটি রাজ্যের যে এলাকায় ঘটেছে সেখানেই নথিভুক্ত হবে এবং সেখান থেকেই প্রমাণপত্র পাওয়া যাবে।
বিদেশে জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনা কিভাবে নথিভুক্ত হবে এবং প্রমানপত্র পাওয়া যায়?	কোনও ভারতীয় নাগরিকের বিদেশে জন্ম বা মৃত্যু ঘটলে ঐ জন্ম বা মৃত্যুর নথিভুক্তকরণ ভারতীয় দূতাবাসে করার ব্যবস্থা আছে। কোন দম্পত্তির বিদেশে থাকাকালীন সন্তানের জন্ম হলে এবং ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফিরে এলে। ফিরে আসার ৬০ দিনের মধ্যে ঐ জন্মের ঘটনা নথিভুক্ত করা যাবে।
দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু, হত্যা বা আত্মহত্যার কারণে মৃত্যু হলে কিভাবে নথিভুক্ত হবে এবং প্রমাণপত্র পাওয়া যাবে?	কোন মৃত্যু সেটি যেভাবেই ঘটুক না কেন, মৃত্যুর ঘটনাটি সুনিশ্চিত হলে সেই এলাকার নির্দিষ্ট সংবাদদাতার মাধ্যমেই নথিভুক্ত হবে এবং প্রমাণপত্র পাওয়া যাবে।
দত্তক সন্তানের জন্মের প্রমাণপত্র কিভাবে পাওয়া যাবে?	ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশবলে দত্তক নেওয়া হলে যে দম্পতি দত্তক নিয়েছেন তাদের নাম পিতা মাতা হিসাবে উল্লেখ করে ঐ সন্তানের প্রমাণপত্র পাওয়া যাবে।
হাসপাতালে বা অন্য কোন ও স্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় চলন্ত যানবাহনের মধ্যে মৃত্যু হলে কিভাবে নথিভুক্ত হবে?	গাড়িটি পরবর্তী গন্তব্যস্থলে যেখানে থামবে গাড়ির চালক ঐ এলাকার স্থানীয় রেজিষ্ট্রার / সাব রেজিষ্ট্রার এর দপ্তরে ঘটনাটি জানাবেন এবং ঐ সংবাদের ভিত্তিতেই ঘটনাটি নথিভুক্ত হবে।
উন্মুক্ত কোনো জায়গায় কোন নবজাতক শিশু বা পরিত্যক্ত মৃতদেহ পরে থাকতে দেখা গেলে তার নথিভুক্তকরণ হয় কি?	ঘটনাটি শহরে হলে পুলিশ অফিসার ইনচার্জ এবং গ্রামের মধ্যে হলে গ্রামের প্রধান ব্যক্তির বা অনুরূপ আধিকারিকের গোচরে আনলে তার সংবাদের ভিত্তিতে স্থানীয় রেজিষ্ট্রার / সাব রেজিষ্ট্রার এর দপ্তরে নথিভুক্ত হবে। যেদিন নবজাত শিশুটিকে বা মৃত ব্যক্তিকে দেখা যাবে সেই দিনটিই তার জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ হিসাবে ধরা হবে।

জন্ম বা মৃত্যুর একাধিক প্রমাণপত্র পাওয়া যেতে পারে কি?	উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে কেউ একাধিক প্রমাণপত্রের জন্য আবেদন করতে পারেন। রেজিষ্ট্রার / সাবরেজিষ্ট্রার কারণ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হলে একাধিক প্রমাণপত্র দিতে পারেন স্বাভাবিক (নরম্যাল) নিবন্ধীকরণ হয়ে থাকলে প্রথম প্রমাণপত্রের জন্য কোন মূল্য লাগবে না কিন্তু পরবর্তী প্রতি কপির জন্য ৫ টাকা করে মূল্য দিতে হবে।
অবৈধ জন্মের নথিভুক্তকরণ করা যায় কি?	শিশুর জন্মদাতার নাম ছাড়াই ঘটনাটির নিবন্ধীকরণ করা যাবে। যদি কোন ব্যক্তি শিশুটির মাতার সাথে যুগ্মভাবে লিখিত বিবৃতি দিয়ে পিতৃত্ব স্বীকার করেন তবে ঐ ব্যক্তির নাম পিতার নাম হিসাবে নথিভুক্ত করা যাবে।
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে স্থানীয় রেজিষ্ট্রার / সাব রেজিস্ট্রার সাথে, জেলায় উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক - ২ এর দপ্তর এবং রাজ্যে উপ মুখ্য জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ ও অধিকর্তা, রাজ্য পরিসংখ্যান সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ, স্বাস্থ্যভবন, সল্টলেকের অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।	

রাজ্যস্তরে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযানের কর্মশালা

সৌরেন বসু, অনুষদ সদস্য, এস.আই.পি.আর.ডি.

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ বোলপুরে শান্তিনিকেতন টুরিষ্ট লজে রাজ্যের সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযানের বিগত বছরের কর্মসূচীর মূল্যায়ন ও এই আর্থিক বৎসরের (২০১১-১২) কর্মসূচীর উপর অগ্রগতির পর্যালোচনা বিষয়ে রাজ্যস্তরে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী শ্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের মাননীয়/ মাননীয়া সভাধিপতিগণ। উপস্থিত ছিলেন সচিব, যুগ্ম-সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি, সর্বশিক্ষা অভিযান, সমাজ কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ইউনিসেফ, কোলকাতার আধিকারিকগণ। উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান, টি.এস.সি টাস্ক ফোর্স, অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী; রাজ্য সংযোজক-স্বাস্থ্যবিধান সেল, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিকগণ ও স্বাস্থ্য বিধান সেলের জেলা সমন্বয়কারীগণ।

কর্মশালায় প্রতিটি জেলাকে ১ লক্ষ পারিবারিক শৌচাগার তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা নির্দ্ধারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলা হয়। শৌচাগারগুলি তৈরীর জন্য চাহিদা সৃষ্টি এবং সেই অনুযায়ী শৌচাগার তৈরীর জন্য রাজমিস্ত্রীদের তালিকা তৈরী করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উপর সভায় আলোচনা হয়। যে ব্লকে স্যানিটারী মার্ট কাজ করছে না সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতিকে মার্ট হিসাবে কাজ করার জন্য জেলা প্রতিনিধিদের জানানো হয়।

আলোচনা সভায় এই আর্থিক বছরের (২০১১-১২) মধ্যে ২৫,০০০ টি বিদ্যালয় শৌচাগার তৈরীর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষত্রে জেলাকে এখনই পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য বলা হয়। বিদ্যালয়ে শৌচাগারগুলির রক্ষনাবেক্ষন ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ব্যাপারে নজর দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরকে অনুরোধ জানান হয়। এছাড়া অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র যেখানে চলছে সেখানে শৌচাগার নির্মাণ ও যে বাড়ীগুলিতে অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র চলছে সেখানে শৌচাগার তৈরীর বিষয়ে জেলা ও ব্লকস্তরে উক্ত দপ্তরের আধিকারিকদের বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

এছাড়া নির্মল গ্রামপঞ্চায়েতগুলি ODF STATUS ধরে রাখা, কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ নিষ্কাশনের বিষয়ে কাজ শুরু করার জন্য আলোচনা হয়। পানীয় জলের পরীক্ষাগার সংক্রান্ত বিষয়ে এই সভায় আলোচনা হয়।

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই কর্মসূচীর বিষয়ে সকলকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে সভার কাজ শেষ করেন।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প অভিযোগ প্রতিবিধান নিয়মাবলী, ২০০৯ - গল্প হলেও সত্যি

— সঞ্জীব সেন, অনুষদ সদস্য, রাজ্য পঞ্চায়েতে ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী

বাবলু ঃ আরে নীলু, বড় রাস্তা দিয়ে আসছো যে? কোথায় গিয়েছিলে?

নীলু ঃ জেলা কোর্টে গিয়েছিলাম বাবলুদা, ব্লকের কেস্টার শুনানি ছিল। ওই যে আমার জমিতে যে পুকুরটা কাটা হয়েছিল না তাতে যে পরিমান টাকা বরাদ্দ ছিল, পঞ্চায়েত তাঁর থেকে ২০,০০০ টাকা মত আত্মসাৎ করেছে।

বাবলু ঃ বল কী? তুমিই বা কি করে জানলে?

নীলু ঃ ঠিকই বলছি গো বাবলুদা। ওই যে জুন মাসে সংসদে সামাজিক নিরীক্ষা হল না, সেখান থেকেই তো জানলাম যে আমার পুকুরটার জন্য নাকি ১,০০,০০০ টাকা খরচ হয়েছে। আমাদের গতিয়ার ১০ ঘর মিলেই তো পুকুরটা কেটেছিল।

আমরা সবাই মিলে মোট ৭২,৮০০ টাকা মজুরী পেয়েছিলাম।

কান্তি খুড়ী ১৪ দিন ধরে কাজটার দেখভাল করার জন্য ২,৭৩০ টাকা পেয়েছিল আর বীরেন খুড়ো জল খাওয়ানোর জন্য — ১,৮২০ টাকা।

আমাদের জবকার্ডে ও পোষ্ট অফিসের খাতাতেও ৭২,৮০০ টাকাই উল্লেখ করা আছে।

আমাদের স্কীমটার মাষ্টার রোল ধরে যখন সবার নাম ও প্রাপ্ত মজুরী পাঠ করল তখন আমরা আমাদের পোষ্ট আফিসের খাতা ধরে মিলিয়ে নিলাম।

এর বাইরে একটা ২০০ টাকার "ওষুধ বাক্স" ছিল, ৯০০ টাকার ছাউনি ছিল আর একটা "স্কীম বিবরণ" বোর্ড যার মূল্য ১,৫৫০ টাকা। নিরীক্ষক দল স্কীমটার ভাউচার পড়ে তো তাই ঘোষণা করল।

আকাশ থেকে পড়লাম যখন ওই একই কাজে আরো ১১ জনের নাম শুনলাম যারাও কিনা ১৪ দিনের মজুরী পেয়েছে। এইভাবে ভুয়ো নাম দিয়ে আরও ২০,০২০ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। মজার ব্যাপার এই ১১ জন শ্রমিকের ৫ জন তো ওই মাসে গ্রামেই ছিল না।

জানতে পেরে আমরা সবাই বি.ডি.ও অফিসে অভিযোগ জানাই। তখন ব্লক অফিস থেকে আমাদের নির্দিষ্ট ফর্ম দেওয়া হয় যাতে আমরা লিখিত ভাবে অভিযোগ দায়ের করি। অভিযোগ প্রাপ্তি স্বীকার হিসেবে তারিখ সহ একটি রসিদও পাই।

এরপর ব্লক থেকে তদন্তকারী একটি দল আমাদের গ্রামে আসে ও অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে সবকিছু লিখে নিয়ে গেল। এর কিছুদিন পরেই তো বি.ডি.ও সাহেব - পঞ্চায়েতের প্রধান, নির্বাহী সহায়ক, সচিব ও নির্মাণ সহায়কের বিরুদ্ধে থানায় F.I.R. করল।

বাবলু ঃ তা হলে তো কান্তি খুড়ীও জড়িত ছিল বলো? সেই তো কাজটার দেখভাল করছিল বললে, মানে হাজিরাই গন্ডগোল তো সেই করেছিল?

নীলু ঃ না গো বাবলুদা, সেই মাষ্টার রোলের লেখা ও সই তো অন্য কারোর। ব্লকের আধিকারিকরা ধরে ফেলেছে। ওই ভুয়ো শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা গেছে যে তাদের জবকার্ড ও পাশবই দীর্ঘদিন পঞ্চায়েতেই রাখা ছিল। লেখালেখি করার নাম করে পঞ্চায়েত সেগুলি নিয়ে রেখে দিয়েছিল। ফেরৎ দেওয়ার নাম করে পঞ্চায়েত তাদের পোষ্ট অফিসের টাকা তোলার কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিল আর নগদ ১০০ টাকা করে দিয়েছিল। সেই সব জবকার্ডে নাকি আরও কারচুপি পাওয়া গিয়েছে যার বিস্তারিত তদন্ত হচ্ছে।

তবে অভিযোগ দায়ের করার ৭ দিনের মধ্যে যে এরকম ফল পাব কখনও আশাই করিনি।

বাবলু ঃ তোমাদেরও সাহসের বলিহারি যে তোমরা এতদূর এগিয়েছিলে।

নীলু ঃ ভয় পেয়ে বসে থাকার দিন শেষ। তোমরা ভয় পেয়ে চুপচাপ থাকো বলে অন্যরা চুরি করার সাহস পায়। আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে। এই ১০০ দিনের কাজের আইনই বলো বা তথ্যের অধিকারের আইন এগুলি যা নাগরিক ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে, সেগুলি প্রয়োগ করলে, আমাদের ঠকায় কার সাধ্য।

(কাহিনী ও কাহিনীর চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

প্রকাশক ঃ রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থার পক্ষে শ্রী দেবাশীস্ নন্দী, যুগ্ম অধিকর্তা, শ্রী সঞ্জীব সেন অনুষদ সদস্য ও শ্রী দীপক কুমার শীল, গ্রন্থাগারিক, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, বি -১৮/ ২০৪, কল্যাণী,নদীয়া